Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে : পুনঃপাঠ ও পর্যবেক্ষণ

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	শহীদ ইকবাল
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.4
Pages	77-95
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৪ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৭

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের *ঘরে-বাইরে* : পুনঃপাঠ ও পর্যবেক্ষণ

শহীদ ইকবাল*

সারসংক্ষেপ : *ঘরে-বাইরে* রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাসগুলোর একটি। এ নিয়ে অনেক প্রকার আলোচনা হলেও, একাধারে বিভিন্ন চলতি তত্ত্বের প্রয়োগ বা ব্যাখ্যায় এ উপন্যাসের আধুনিক তাৎপর্যটি কখনোই যেমন হারায় না তেমনি তার ভেতর-বিশ্লেষণের কার্যকারণ জিজ্ঞাসাও মলিন হয় না, বরং ভবিষ্য-অভিমুখ নির্ণয় করে। ফলে সর্বদাই এটি এক 'নতুন পাঠ'। এর 'এঙ্‌জাইটি অব ইনফ্লুয়েন্স'ও কম নয়। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে, উপন্যাসতত্ত্ব ও শৈলীর বিবরণে *ঘরে-বাইরে*র পদক্ষেপসমূহ যাচাই করবার প্রয়াস পাওয়া গেছে। মূলত, রবীন্দ্র-দৃষ্টিভঙ্গিরই এক-চিলতে আলো এ উপন্যাসের ভেতর দিয়ে অনুধাবনের ইচ্ছে, অনুমান করি। তবে এ নিয়ে আরও বিস্তারিত ও নতুন পাঠের অবকাশ আছে, এবং এখানে তা এক অর্থে উৎসাহ দানেরই চেষ্টা বলা যায়।

ফরাসি সাহিত্য সমালোচক রলাঁ বার্ত (১৯১৫-১৯৮০) *The Death of the Author*-এ বলেছেন : 'টেক্সট কোনো শব্দসারি নয় যা একটি 'ঈশ্বরতত্ত্বগত' অর্থ প্রদান করে, বরং এটি এমন এক বহুমাত্রিক ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন ধরনের লেখা, যার কোনোটিই মৌলিক নয়, মিশ্রিত হয়, এবং পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। টেক্সট হচ্ছে সংস্কৃতির অগুনতি কেন্দ্র থেকে নেয়া উদ্ধৃতির একটি সূক্ষ্ম বস্তু' (বার্ত, ২০১৫ : ১৩)। একইভাবে আমেরিকান ক্রিটিক হ্যরল্ড ব্লুম (জ. ১৯৩০) *The anxiety of Influence* (১৯৭৩)-এ দেখিয়েছেন : 'কবিদের ইতিহাস তৈরি হয় শক্তিমান কবিদের একে অপরের ভুল পাঠ দ্বারা, আর সে ভুল পাঠের উদ্দেশ্য হলো তাদের নিজেদের কল্পনার জন্য জায়গা পরিষ্কার করা' (ফকরুল, ২০১৬ : ৪১০)। এরূপ বিবেচনা আমলে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের *ঘরে-বাইরে* উপন্যাস পাঠের একটি পর্যবেক্ষণ-প্রস্তুতি নেওয়ার ইচ্ছে জাগে। তবে বক্ষ্যমান প্রবন্ধের আলোচনা ঠিক উপর্যুক্ত তাত্ত্বিকের কোনো তত্ত্বালোচনা বা বিশ্লেষণ নয়। নিছকই এক ধরনের পাঠ-পুনর্মূল্যায়ন। '*ঘরে-বাইরে* ১৩২২ সালে (বৈশাখ-ফাল্গুন) 'সবুজ পত্রে' মুদ্রিত হয়

*অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

এবং ১৩২৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭৪ : ৫২১)। উপন্যাসটি প্রকাশের পর তৎকালীন জনসমাজে নানারকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তার জবাবও দিয়েছিলেন। এরূপ জবাবে রবীন্দ্রনাথের সন্দিগ্ধ সাহিত্যরুচির অভিপ্রায় ও প্রকাশরূপ সম্পর্কে ধারণা মেলে। তাঁর উপন্যাসের আয়োজন ও উদ্দেশ্য নিয়েও একপ্রকার জরুরি সংবাদ-দর্শন পাঠকের সম্মুখে অবমুক্ত হয়।

যা হোক, *ঘরে-বাইরে*কে পরিপূর্ণ রাজনৈতিক উপন্যাস বলা না গেলেও এর মধ্যে যে রাজনীতি অপ্রকাশ্য নয়, তা সত্য। 'উপন্যাসের মুখ্য অবলম্বন কিন্তু রাজনীতি' (নারায়ণ, ১৩৭৩ : ১৫২)। রাজনীতির সুতোয় বাঁধা পড়েছে উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র– বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ। রবীন্দ্রনাথের এ উপন্যাস নিয়ে বিখ্যাত মার্কসবাদী উপন্যাস-তাত্ত্বিক গেয়র্গে লুকাস (১৮৮৫-১৯৭১) বলেছিলেন 'গান্ধী নবেল' (দেবেশ রায় : ২০১৫)। কিন্তু এমন মন্তব্য কমিটেডলি অস্বীকার করেছেন বঙ্গীয় লেখক ও উপন্যাস-তাত্ত্বিক দেবেশ রায়। তিনি লুকাসের বিপরীতে নিপুণ একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে :

> *ঘরে বাইরে* লেখা হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধের বছরগুলিতে – প্রথম কাগজে ধারাবাহিক বেরয়, পরে বই হয় (১৯১৬)। ১৯১৯ নাগাদই এর ইংরেজি অনুবাদ *Home and Abroad* বেরিয়ে যায়। *ঘরে বাইরে* রচনাকালে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছেন বটে কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও আদর্শ তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। *ঘরে বাইরে*তে যে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের কথা বলা হয়েছে সেটা ১৯০৫ থেকে ১৯০৮-এর স্বদেশী যুগের ঘটনা (দেবেশ রায় : ২০১৫)।

উপন্যাস কী বা উপন্যাসের পাঠ-তত্ত্বের ভিত্তিটি ঔপনিবেশিক প্রবণতা দ্বারা কতোটা নিরূপিত কিংবা সেরূপ মনস্তত্ত্বগত ধারণা দীর্ঘ সময়ে আমাদের চিন্তায় যে দখলি মনস্তত্ত্ব গড়ে দিয়েছে – তা থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে দেবেশ রায়, লুকাস বা 'উপন্যাস আধুনিক গণতন্ত্রের ফসল' – এমন গৎবাঁধা চিরাচরিত ধারণাকে বাতিল করে বলা যায়, 'উপন্যাস ব্যক্তির বিকাশের বা বিকাশের সংকটের কাহিনী নয়, অনেক সময়ই সামাজিক বিকাশ ও সংকটের কাহিনি, অনেক সময়ই সিস্টেমের সংকটকথা' (দেবেশ রায় : ২০১৫)। এতে এই রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আস্থায় বা প্রবণতায় আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন। সে পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই *ঘরে-বাইরে* সবকিছুর ঊর্ধ্বে একটি পূর্ণ স্থির উপন্যাস। এর কারণ, সমাজ বিকাশের স্তর এবং ব্যক্তি-সংকটের কাহিনি এতে দাঁড়িয়েছে, জমে উঠেছে এবং ওইরূপে তা সৃজিত হতেও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। বিশেষ করে, চরিত্রের ত্রিভুজ রেখায় পরস্পরের টান, আকর্ষিত-বিকর্ষিত শক্তি, অকুস্থলের জমিনে পদচিহ্নের সাবলীলতা, চেতনার পারস্পরিক সংবর্ধনা, আদান-প্রদান ও আদায়-বিদায়ের সম্ভাব্য প্রান্তচিহ্নিত রূপ, প্রবণতার মনস্তত্ত্বে যুক্তি ও বিসম্বাদ একক কখনো সামষ্টিক আয়োজনে সেলুলয়েডত্ব পায়। এটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াতেও যেমন দ্রুত নয় তেমনি পরিবর্তন-রূপান্তরের ঝলকও কার্যকারণহীন

নয়। বিচ্ছুরিত আলো-হানা শরে অন্ধকারের আবদ্ধ কূপ ব্যাঙাচি দৃষ্টি পরিবর্তন করে অকুণ্ঠ হয়– কুসংস্কার-কূপমণ্ডূকতার জাল ছিন্ন করে অভীপ্সা আর ইচ্ছাস্বপ্ন দুলে ওঠে, প্রাপ্ততার জন্য নয় যেন প্রাপ্ততার উপকূলসমূহ নির্ণয় বা চিহ্নিতকরণের নিমিত্ত। বিমল-সন্দীপ বা নিখিলেশ-বিমল কিংবা সন্দীপ-নিখিলেশ যোযুদ্ধমান দ্বৈরথ, এবং অতঃপর মাস্টারমশাই, অমূল্যসমেত সেই দ্বৈরথ তটিনী চিনে নেয়া এবং এগিয়ে যাওয়া। নিশ্চয়ই এসব 'গান্ধী নবেলে'র আওতার নয়! অন্তর্নিহিত গতিময়তা আর তাতে নিঃশব্দ স্বয়ম্ভূ-স্বাধীন শক্তিকে করে বাঞ্ছিত। সময়-সংকটের সিস্টেমে যা মৌলিক মানব-দর্শনের চিন্ময় উত্তাপে সংগ্রথিত। এইতো মৌলিক মানবরূপের দর্শন – যা ভারতবর্ষের চিরসত্যের আনুকূল্যবাহী। এই স্বীকারোক্তি রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যেও বিদ্যমান : 'তেমনি যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভেতর দিয়ে হয়তো আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, এ কথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করছে (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭৪ : ৫২২)। এইটি তো তাঁর বাঞ্ছিত দেশ-ধর্ম-কাল ও প্রতিবেশ। তবে *ঘরে-বাইরে*কে শিল্পবিবেচনার বাইরে নিছক রাজনৈতিক মনে করলে কী পাই? আবার সমাজভাবনার তলে দেখলে তখন কী মেলে? সমাজ-রাজনীতির অখণ্ড রবীন্দ্রনাথ কেমন? শিল্পের তো সমাজ-সৃজিত একটি কাঠামো আছে – বিশেষ করে উপন্যাস শিল্পের যে ফ্রেম তাতে বাস্তবের অভিঘাত তো অনতিক্রম্য। সে লক্ষ্যে *ঘরে বাইরে* সুদূর ও সুন্দরের আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠতে পারে – বিশেষ করে, উপন্যাস-তত্ত্বের নির্ধারিত 'পয়েন্ট অব ভিউ' থেকে।

২.

ঘরে-বাইরে কেবল স্বদেশী আন্দোলনের ইতিবৃত্ত নয় – কিংবা নয় নীতিশাস্ত্র অথবা তত্ত্বগ্রন্থ– এ উপন্যাসের মৌল সংকট চরিত্রের – এ লক্ষ্যে বলা চলে, উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকের প্রথমপাদে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষে তথা বাঙালির মধ্যে যে সংস্কার নীতির সঙ্গে বস্তুবাদের, জড়বস্তুর ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা বিগলিত বিকার কিংবা ব্রিটিশ প্রশ্রয়ে গড়ে ওঠা পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণির রোরুদ্যমান রূপ – তারই প্রতিভূরূপে নির্মিত হয় উপন্যাসের এই তিনটি প্রতীকী চরিত্র। সমাজই এর মুখ্য প্রতিপাদ্য। এখানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থাপন-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে উপন্যাসের স্বরূপও বদলেছেন। এক্ষেত্রে লেখক-পরিস্রুত আত্মকথনের পরিসীমা পেছন-স্মৃতির এবং বিবরিত উপস্থাপন-কৌশলও চলিতরীতির। প্রশ্ন জাগে, এ অবয়বটি কেন গড়লেন রবীন্দ্রনাথ! কারণইবা কী? এর উত্তরে লেখক-সমকালে তাঁর রচিত কিছু প্রবন্ধ কিংবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়সীমায় 'কবি' রবীন্দ্রনাথের নবসৃষ্ট রচনাকৌশল স্মরণে রাখা যেতে পারে। কারণ, আত্মকথন তো বাইরের কোনো ঘটনাস্রোত নয়– ভেতরের মনস্তত্ত্ব, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বিকার-বিনষ্ট, আস্থা-অনাস্থার প্রদাহ; অধিক আনন্দ ও

নৈরাশ্য, ব্যক্তিগত নৈঃসঙ্গ্য কোনোটাই তাতে কম নেই। ফলে এই স্বরূপের চিত্রার্পণ কবি রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাস। বক্ষ্যমান উপন্যাসটি কবিতামুখী প্রবণতায় ভরা। সেখানে চরিত্রের কথোপকথন, আশা-আশাহত, স্বপ্ন-স্বপ্নভঙ্গই মুখ্য। তাই-ই করেছেন রবীন্দ্রনাথ। মাত্র তিনটি মুখ্য চরিত্র দিয়ে বুঝিয়েছেন, ভেতরের কষ্ট-আনন্দ আর সমাজের চলমান বিবর্তমান রূপ-কাঠামো। বিষয়-নির্ধারণের কেন্দ্রে স্বদেশী আন্দোলন। এ নিয়ে তিন চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব, টানাপড়েন, ব্যক্তিত্ব-অহং কম নয়। বাস্তব ও বস্তু-কাঠামো ধরে তিনি উপন্যাসের আঙ্গিক নির্মাণ করেন। এক্ষেত্রে সমাজ সচেতনতাই শুধু নয়, আঙ্গিকের ভেতরে ওই রাজনৈতিক প্রবন্ধের পলাতকা ছায়া প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়ে ওঠে। রাজনীতি (কবি) রবীন্দ্রনাথের প্যাশন নয় কিন্তু ভারতবর্ষের রাজনীতির রেণু গড়ে দেয় ভঙ্গুর সামন্তসমাজের ব্যক্তিমানস। এই মানস-কাঠামোর দ্বন্দ্ব ও অভিমুখ সৃজনই কাহিনির নিষ্ঠা ও কাঙ্ক্ষিত প্রতিপাদ্য। তাতে সূক্ষ্ম দ্বিধা, উইট-হিউমার, কটাক্ষ, প্রাঞ্জল তর্ক-বিতর্ক আর অস্তিত্ব-সংকটের বিহ্বলতা দিয়ে উপন্যাস উপলভ্য হয়। তবে বিশ শতকের প্রথমার্ধের ভারতবর্ষ তথা রাজনীতির জটিল কূটাবর্তের চেয়ে সমাজ-চরিত্রের 'আগুনের ভেতর থেকে উঠে আসা আমির' সম্ভ্রম-সত্তার অভিমুখ চিহ্নিতকরণই *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। বস্তুত, সে লক্ষ্যেই তাঁর আঙ্গিক-নির্দিষ্টতা।

৩.

*ঘরে-বাইরে*তে নির্ধারিত কাহিনি নেই। কাহিনিটি চরিত্র-মনের। মনের কাঠামোটি রাজনৈতিক রেণু ছড়ানো হলেও ব্যক্তিসত্তার ঔপনিষদিক[১] অভিপ্রায় উন্মোচনের দিকটিই অন্যতর। এ লক্ষ্যে 'বিমলার আত্মকথা' শিরোনাম দিয়ে উপন্যাস শুরু। বিমলা মা ও দেশমাতা স্বরূপা। নিজের কথায় তার বিয়ে, নিখিলেশ, শ্বশুর পরিবারের অন্তঃপুর গড়ে ওঠে। স্বামীর আদেশ-উপদেশ, দেনা-পাওনা, চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিমলার নিজের অবস্থানও স্বতন্ত্র। সামন্ত চিন্তাধারার সংসারে স্বামী নিখিলেশ, পরিবারের সদস্যগণ, তাদের দুঃখ-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-বঞ্চনার পরিচয় পেরুনোর সর্বংসহ প্রচেষ্টা। কাহিনির মুখ্য কেন্দ্রে (focal point), এবম্বিধ নীতি ও চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে। বিমলা বলছে : 'আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালোবাসতেন তার গোড়ার কারণটা এই যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টানতে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারই গুণ, কিংবা আমার গ্রহনক্ষত্রের চক্রান্ত।'এছাড়া এ পর্বে আরও বলা আছে :

> বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল, কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি সেজন্যই নতুন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মতো আমাদের ভয়-ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কী হল, কী হবে, তা বোঝবার সময় পাই নি।...

> এই সময় সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্য দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেলবেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের এক দিকে চিক করে ফেলে বসে আছি। 'বন্দে মাতরম্' শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আসছে, আমার বুকের ভেতরটা গুর্ গুর্ করে কেঁপে উঠছে।...
>
> সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বলতে পারি নে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমন-কি, রীতিমত সুশ্রীই। তবু জানি না কেন আমার মনে হয়েছিল উজ্জ্বলতা আছে বটে, কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে গড়া – চোখে আর ঠোঁটে কী-একটা আছে যেটা খাঁটি নয়।'...
>
> আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পারলুম, আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকেই তাঁর ভাষার আগুন আরো জ্বলে উঠল।

এসব নিয়ে নিখিলেশ কিছুই বলেনি। প্রথমত, বিমলার সংস্কারে তা ঠিক মনে হয়নি। কিন্তু ক্রমশ সে প্রবৃত্তির পেন্ডুলামে দুলতে থাকে। এক পর্যায়ে স্বভাবমতো সে অনুগত হয় সন্দীপের দিকে। নিখিলেশও স্বভাবশীলতায় বিমলাকে বা তার প্রবৃত্তিসত্তার অহংকে স্বাভাবিক পথে বাধাহীন চলতে দেয়। এই চলতি পথেই সন্দীপ তার মনে প্রাধান্যপ্রবণ হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। বাড়িরও অন্যতম হয়। এই 'হওয়া'র ভেতরে মিলেমিশে থাকে সন্দীপ-প্রভাবিত দেশ-দর্শন। তবে 'দেশ-দর্শন' যে সন্দীপের ব্যক্তিগত চালাকি তার প্রমাণ মেলে ঘটনাপ্রবাহের ধারায় হৃৎপ্রবৃত্তির গতিময় প্রান্তসমূহ স্পর্শ করলে। দেশ-জাতীয়তা আর 'কুৎসিত' ব্রিটিশ উপনিবেশ নিয়ে আখ্যানপ্রবাহের প্রারম্ভিকপর্বেই বিমলার আত্মকথনে উপন্যাসের সংকেত ঘনীভূত হয়ে ওঠে। নিখিলেশের আত্মকথন-পর্বে অনেক প্রশ্নের ভেতরে সে উচ্চারণ করে 'একদিন বিমলকে বলেছিলুম তোমাকে বাইরে আসতে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে – সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোটো জায়গা এবং ছোটো কর্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি।...' সন্দীপ সর্ম্পকে সে বলে 'আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে... কিন্তু বিমলাকে এ কথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেকখানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা করছে, তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বলতে আমার মন ছোটো হয়ে যায়'। 'সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে' – চন্দ্রনাথ বাবুর এমন পরামর্শটি নিখিলের মনে ধরে। সে রংপুর যাওয়ার কথা তুললে সন্দীপ ছড়িয়ে না পড়ে কোনো কেন্দ্রে ('মউচাকের মক্ষীরাণী') শক্তি সঞ্চয়ের কথা বলে। দ্বন্দ্বটি ক্রমশ স্বদেশতত্ত্ব থেকে 'ঘরে-বাইরে'তে পৌঁছায়। যে কারণে নিখিলেশের দার্জিলিং যাবার প্রস্তাবও বাতিল হয়ে যায়। ঘর থেকে বাহির, ছোটো রাস্তা থেকে বড়ো রাস্তা – এটা বুঝি মাঝখানের ঝড়? সন্দীপ কী সেই ঝড়ের 'আদ্যাশক্তি'? তবে সত্য কোনটি – যে

সত্যের অপেক্ষায় নিখিলেশ স্থিত! কাহিনিধারায় এরপর সন্দীপের উপস্থিতি। 'দেশ আমার' বাণী নিয়ে সমুপস্থিত। 'সন্দীপের আত্মকথা'য় সন্দীপের ইচ্ছা ও মতের প্রকাশ ঘটে। স্বদেশ বলে শুধু কথা নয়, নিখিলেশের স্ত্রী বিমলা প্রসঙ্গে সে তন্ত্র-মন্ত্র; সমাজ মূল্যবোধের চেয়ে 'অ্যাফিনিটি'র সত্য সংকোচহীনভাবে প্রত্যাশা করে। সে আদায় করতে জানে, নিজেকে জানাতে আগ্রহী এবং অন্যের কাছে প্রকাশ করতেও সংকোচমুক্ত। বিমলাকে সে 'মক্ষীরাণী' ভেবে তার পাশেই দ্বিধাহীন গুণগুণ করে। ক্রমশ নারী-পুরুষের ও নিকট সংস্রবে বিমলার স্বীয় অবস্থান নিয়ে ঘটনাক্রম – উৎকর্ষের পথে যাত্রা করে। সূক্ষ্ম মন, রহস্য ও টানাপড়েনে বাধা পড়ে। স্বদেশব্রত সেখানে উপলক্ষমাত্র। এই উপলক্ষের মধ্যেই বিমলা উগ্র- 'দ্রোহী' – আতিশয্যপ্রবণ-চতুর এক পুরুষশক্তির আকর্ষণের পথে পা বাড়ায়। ওইতো ওর জিজ্ঞাসা : 'সন্দীপ বাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্যের দিকে যেন পুজোর প্রদীপের মতো জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য, সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার মতো আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে গেল।' সন্দীপ সম্পর্কে তার মনোবাঞ্ছা দীর্ঘায়ত হতে থাকে, স্বদেশের কর্তব্যটা তার মধ্য দিয়ে মূল্যায়িত হতে থাকলে, সমর্থনও পেয়ে যায়। ক্রমশ নিখিলেশ ও সন্দীপের মধ্যে 'ছাই চাপা আগুনে'র ন্যায় দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। সেটি কী যুক্তির না অ্যাফিনিটির নাকি ক্ষমতা বা শক্তির – যার কেন্দ্রে আছে বিমলা! *ঘরে-বাইরের* মূল তো বিমলা – সেই তো ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, সন্দীপ তাতে অনুঘটক হিসেবে থাকে, কিংবা সন্দীপের এ আকর্ষণ বিমলাকে বাইরে আনার জন্য চেষ্টা যতোটা তার চেয়ে তার 'পুরুষ'-ব্যক্তিত্ব ও অহং কাজ করে থাকে অধিক এবং সে আধিক্যের মধ্যে বিদ্যমান নিখিলের স্থিরত্ব ('সৎ'+'চিৎ') কিংবা তার প্রতি সন্দীপের প্রতিহিংসা, গূঢ়ৈষা প্রভৃতি। তিনটি চরিত্রই তখন প্রবল উত্তাপের অভ্যন্তরীণ শক্তি নিয়ে দ্বৈরথে নেমে পড়ে। ওতে স্বদেশী 'সঙ'-মাত্র। উপলক্ষপ্রবণও। সন্দীপের এ উপলক্ষের ভেতর দিয়ে প্রবৃত্তিজাত স্থূলচাতুরী ও মেধার প্রকাশ কম নয়। সেটি দেশকে ঘিরে, স্বদেশী হয়ে, ব্রিটিশ বেনিয়ার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড়িয়ে, বিলেতি পণ্য বর্জন করে – যে উত্তপ্ত আবেগ জমা করে তা তার স্বার্থে কাজে লাগায়। আবেগের চাঞ্চল্যে সে স্বার্থটুকু দেখা না গেলেও এক পর্যায়ে ভুঁইফোড় বৃথা-তত্ত্বে আটকে পড়ে 'স্বদেশী' ভাবনা। অমূল্যর মতো নিবেদিত স্বদেশীও সন্দীপকে বুঝতে সময় নিতে হয় না। বিমলা যেভাবে নিখিলেশকে নিভৃতে রেখে সন্দীপের সঙ্গে মিশেছে – তার কারণ কী? নিখিলেশ অন্তর্মুখী-'শুদ্ধ-সংবিৎ' – সন্দীপ তার বিপরীত – বিমলার জন্য 'মক্ষী' শব্দটি উচ্চারণ করে। বিমলা সমস্ত মানসিক টানাপড়েন উপেক্ষা করে, নিখিলেশকে আমলে না নিয়ে সন্দীপকে প্রশ্রয় দেয়। মুসলমানদের স্বার্থ উচ্ছন্নে যাক, সন্দীপের সেটি কোনো আবেগ নয়, তত্ত্ব নিয়ে নিদেনপক্ষে স্বদেশী চাই – সেটি মুসলমান বা জাতের কী যায়-আসে তা তার

জানা নেই। কিন্তু নিখিলেশ নির্বিকাররূপে ওভাবে স্বদেশীদের সমর্থন দিতে পারে না। ওটা অনিশ্চিত পথ। খুদে হিন্দু জমিদার হয়েও সে মুসলমানদের পেশা-সম্পদ নষ্ট না করার পক্ষে। সন্দীপের এই স্বদেশী হওয়ার কারণ বা স্বার্থ সেসব ঢের জানে নিখিলেশ। কিন্তু নিখিলেশের পরামর্শ সে নেয়নি। স্বদেশী হওয়ার জন্য বিমলাকে উদ্বুদ্ধ করা, দলে নেওয়া বা তার পরামর্শে (এ পরামর্শ কী-না এক নারীর আদেশ মেনে চলা) চলা এবং কেন্দ্রের কর্মপরিচালনার ভার দেওয়া সবই সন্দেহসূচক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সন্দীপের এ কাজগুলো নিখিলেশের জন্য স্বাভাববিরোধী, গাত্রদাহও। এভাবেই সতর্ক উত্তেজনার ভেতর দিয়ে উপন্যাসের কাহিনি এগোয়। ক্লাইমেক্স স্পর্শ করে। স্বদেশীরা তুঙ্গে, ব্রিটিশদের চাপ, নিখিলেশের ওসব অমর্যাদাকর প্রতিবেশের বিপরীতে সন্দীপের ফলহীন নির্বিকার ক্যারিকেচার চিত্তাকর্ষক কাহিনি তৈরি করে। নিখিলেশ ভারতমুক্তির পক্ষে, কিন্তু কীভাবে সে মুক্তি ঘটবে তা সে বলেছে – ওই 'আত্মমুক্তি', সবকিছুর ভেতর দিয়ে আত্মার মুক্তি, ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্যকে বুঝেই এগুনো – তার ভেতরেই মুক্তির বাসনা – কিন্তু স্বদেশীর তা নয়। স্বদেশীর নামে সন্দীপের সবকিছুই লোক দেখানো। ভড়ং। যে পথে সে বিমলাকে নিয়ে গেছে সেটি নিখিলেশের বিপরীত পথ – এবং অবশ্যই তা তার পছন্দের পথ নয় – যদিওবা সে বলেছিল বিমলা বাইরে যাক – সন্দীপের কথা শুনলেও বুঝে চলুক, স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হোক। কিন্তু বিমলা খুব দ্রুত স্বদেশীর ফাঁদে আটকায় অর্থাৎ বিমলা সন্দীপের পক্ষে রায় দিয়েছে। এ আস্থার কেন্দ্র কী সন্দীপ না স্বদেশব্রত! রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত নিখিলেশের ইঙ্গিত। উপনিষদীয় তত্ত্ব-দর্শন। নিখিলেশ তাই। নিখিলেশের উদ্দেশ্য সে সঠিক পথে চলুক, ওভাবে সন্দীপ-মনস্ক না হয়ে বা স্বদেশের 'অপরিচিত' ঝাণ্ডা কাঁধে না নিয়ে বাইরের জগতটা মনের জানালায় উন্মুক্ত করুক। চিনে নিক ভারতবর্ষের দস্তুর (প্রথা)। বিমলা তা পারে নি – সে পথে পাও বাড়ায় নি। একপ্রকার বাইরের জৌলুস আর অহংকারের মুগ্ধতায় সে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রবৃত্তির ভেতরে বাধা পড়ে। তবে নিখিলেশের মতে প্রবৃত্তি শুধু নিবৃত্তি নয়। তার প্রত্যাশা আরও অধিক। সন্দীপ যে বলেছে 'প্রবৃত্তি প্রকৃতিরই গ্যাসপোস্ট'। এভাবে সন্দীপ ও নিখিলেশের মধ্যে দ্বন্দ্বে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত। একইসঙ্গে রাজনীতিও। রবীন্দ্রনাথ বস্তুত নিখিলেশেরই প্রতিকৃতি। কারণ শেষ পর্যন্ত স্বদেশী-সন্দীপ তার রাজনৈতিক-দর্শনটি জনতার ভেতরে প্রত্যক্ষ কার্যকারিতা পায় না। তার আবেগ ও করুণাশ্রিত স্বভাব প্রবৃত্তির অনাচার বিপথে যায়। এক পর্যায়ে তার ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষাও অবাস্তব ও অহেতুক আবদ্ধতায় পড়ে। যেখানে সম্পদ-ক্ষমতা-প্রভাব অপ্রধান থাকে না। বিমলাও অধীত সম্পর্কের প্রান্তগুলোও চিনতে পারে। তার অসহায়ত্ব বা প্রবৃত্তির ইন্ধনগুলো টের পায়; সচেতন হয়ে ওঠে। ক্রমশ তেজোদ্দীপ্ত, শ্লোগানসর্বস্বতা, আপাত জনস্বার্থমূলক মনে হলেও কার্যত আবেগময় কর্মপ্রয়াসের মধ্যে তার চিন্তা-দর্শনের যে ব্যবহারিক ফারাক সেটা

চেনা যায়। সন্দীপের বচনেও সঠিক ও ধারাবাহিক সত্যটি অনুসৃত হয় না। বিমলা প্রথমত নারী, সেও এক সময় জৌলুসময় করিৎকর্মার দর্শনকে অকিঞ্চিৎকর মনে করতে থাকে। এই পেছন ফেরা এবং আত্মসিদ্ধ ও সত্য-উত্তীর্ণ তথা নিখিলেশের পৌঁছানো – উপন্যাসের মেসেজ, কার্যত রবীন্দ্রনাথের বিশ শতকের প্রথমপাদের সমাজচিন্তার দর্শন। সন্দীপের বহ্বাস্ফোটে লঘুক্রিয়া কার্যত ওই সমাজের রাজনৈতিক স্থূল উত্তাপমাত্র। বিলেতি পণ্য বর্জন ও পোড়ানো প্রকারান্তরে রাজনৈতিক সহিংসতা, সেটির সমর্থন বা তার ভেতরে উপনিবেশবাদ অস্বীকার করার চৌম্বক প্রণোদনা তাৎক্ষণিকভাবে বিদ্যমান কিন্তু তা যে সামগ্রিক জনজীবনের বাস্তবানুগ নয়, তা সত্য বলে প্রতীয়মান হয় না। ধনী-গরিব, উচ্চ-নীচ, জাত-ধর্ম নিয়ে ভারতবর্ষ যে বহুবিচিত্র মানুষের আচার আনুষ্ঠানিকতার সৌধ সেখানে কোনো সম্প্রদায় বা বর্ণের দিকে কিংবা সত্যটি না বুঝে রিএ্যাকশনারি কিছু করলেই যে 'ব্রিটিশ' বা উপনিবেশবাদ বিলুপ্ত হবে তা নয়। প্রয়োজন আসতে হবে ভেতরের জাগরণে। বাইরের আবেগ বা স্ফূর্তি দিয়ে দেশমুক্তি ঘটবে না। *ঘরে-বাইরে*তে দেখা যায় যে অঞ্চলের জমিদার নিখিলেশ, সেখানে স্বদেশীরা যা করছে – তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফায়দা লুটছে কেউ কেউ। গরীবরা সম্পদ হারিয়ে পথে বসেছে। এতে কেউ নেতা হচ্ছে, কেউবা ক্ষমতার শক্তি পাচ্ছে কিন্তু সুপথ অর্জিত হচ্ছে না। সন্দীপের ভেতর দিয়ে রাজনীতির চাল ও ভুঁইফোড় আভিজাত্যই শুধু প্রকাশ পেয়েছে, যেটি আপাত নেতৃত্বসুলভ মনে হলেও – তা সঠিক পথ নয়। রবীন্দ্রনাথের পথ নয়। এক পর্যায়ে বিমলার ত্যাগ, স্বদেশীদের কাছে দামী অলংকার দিয়ে দেওয়া সবই ছিল 'বন্দেমাতরম্' দেশমাতার বিশ্বাসে। কিন্তু নেতার বিলাসী জীবনযাপন বা চলাফেরা ক্রমশ প্রত্যক্ষগোচর হয়ে পড়লে কিংবা সন্দীপের ভেতরের অকার্যকর খোলসআবরিত সত্যটিও প্রকাশ পেলে – সবকিছু ধসে পড়ে। বিমলার ভেতরেও তখন অনিবার্য পরিবর্তন ঘটতে থাকে – যেখানে নিখিলেশ-আশ্রিত চিৎ-সত্যের অবমুক্তিই বটে। প্রকৃত সত্যের পথিক বলে তা শ্রেয়োশীলতারও নামান্তর বটে।

ঘরে-বাইরে উপন্যাসের কাহিনিতে স্থূল ও সূক্ষ্মতা, অন্তর ও বাহির, রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের দ্বন্দ্ব চকিত হয় নিখিলেশ ও সন্দীপকে উপলভ্য করে। নিখিলেশের বাড়িতে আগন্তুক সন্দীপ বন্ধুত্বের সূত্রে প্রবেশ করে এবং ক্রমশ বাইরের জৌলুশে – ঔদ্ধত্যপূর্ণ বাকপটুতায় বিমলাকে অধিকার করে বসে। নিখিলেশ প্রথম দর্শনে একদিকে বন্ধুত্বের খাতির অন্যদিকে ভারতমুক্তির রাজনীতির একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বন্ধুকে সহজভাবে গ্রহণ করে নেয়। একইভাবে বিমলার সম্পৃক্তিকেও সে গুরুত্বহীন মনে করে না। ঘর থেকে বাইরে গমন বা মানবমুক্তির দর্শন কিংবা আত্মার মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিমলা আর সন্দীপের যুক্তিকে শুধু একজন 'দর্শক' হিসেবে জেনেছে। কিন্তু ক্রমশ সবকিছুর কেন্দ্রে চলে আসে বিমলা তার মধ্য দিয়ে দুই বন্ধুর বিরোধ। একদিকে রাজনৈতিক মতভিন্নতা অন্যদিকে বিমলার সম্পৃক্তির মনস্তত্ত্ব–

সেখানে ব্যক্তিত্বের জোর বা সম্পর্কের অভিমুখ একপ্রকার পর্যায় অতিক্রম করে। মনস্তত্ত্বও জটিল আকার নেয়। সে জটিলতা রাজনীতির পথের সমর্থন বা অসমর্থন নিয়ে; দৃষ্টিভঙ্গির সত্যেও। এতে অনুঘটক হয় বিমলার অবস্থান। বিমলা নারী, নারী-পুরুষ সম্পর্ক বা উভয়ের জৈবজীবন কাহিনির উল্লেখযোগ্য ঘটনাসূত্র। রবীন্দ্র-উপন্যাসের গবেষক বলেন : 'বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপের চেতনায় গভীরতর তাৎপর্যে ঘটনা যতটুকু উজ্জ্বল, এ উপন্যাসে ঘটনার মূল্য ততটুকুই। মূলত : তাদের আত্মকথার মধ্য দিয়েই 'ঘরে-বাইরে'র চেতনাশ্রয়ী সমগ্র ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত ও চরিত্রের অন্তর্জগৎ পাঠকের মনোগ্রাহ্য ও দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে' (আকরম, ১৩৯৪ : ২৯৭)। এটি সত্য। তিনটি চরিত্রই আত্মকথনে অভ্যন্তরীণ কথাবার্তা বলেছে। এক্ষেত্রে বিমলা ব্যতিক্রম। সে ডায়েরি লেখেনি। উপন্যাসে সময়ের অতিক্রমণান্তে করেছে স্মৃতিচারণ। সন্দীপ ও নিখিলেশ সময়কে ঘিরেই তাদের আত্মকথন বলেছে। তাই ঘটনাপ্রবাহে স্ত্রী হয়েও বিমলা ও নিখিল এবং বহিরাগত বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণ যাই ঘটুক শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছে প্রবহমান জীবন ও সংসারে। এ সংসারধর্মে বিমলার উপলব্ধি শাশ্বত ভারত-ঐতিহ্যের ধারক এক নারীর উপলব্ধি – 'আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি। যা পুড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। যা বাকী আছে তার আর মরণ নেই। সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলাম তার পায়ে। যিনি আমার সকল অপরাধকে তার গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেছেন। আজ জানি, তার মতো মানুষ হয় না' (সত্যজিৎ, ১৯৮৪)। তবে বিশ্বাস বা স্বাতন্ত্র্য নিজস্ব ও উপলব্ধিজাত হলেও আখ্যানে রবীন্দ্রনাথ মিলিয়ে দেন – কার্যত তারই আকাঙ্ক্ষার অভীষ্ট প্রতিরূপ। যা শিল্পসম্মত ও চিরায়ত। কার্যত, একটি 'আইডিয়া'রও বহিঃপ্রকাশ।

৪.

উপন্যাসের নিখিলেশ চরিত্রটি রবীন্দ্র-স্বরূপে বিন্যস্ত। রবীন্দ্রনাথেরই আদর্শজাত। তাঁরই ভাববস্তু। 'নিখিলেশের চিত্তচেতনায় দেশ, সমাজ ও সময় সম্পর্কে ভাবনা স্বতন্ত্র। সমকালীন স্বদেশী-আন্দোলনের কৌশলকে সে সত্য বলে মনে করে না। নিখিলেশও স্বদেশী, সে এক অর্থে স্বয়ং স্বদেশী প্রচলনের ইতিহাস।' এই 'স্বয়ং' অংশতেই বিরোধ। তাতে খুব শৈলিসম্মতভাবে প্রবিষ্ট হয় নিখিলেশের স্ত্রী বিমলা। নিখিলেশের তাতে আপত্তি ছিল না। যে উদার ও অনাসক্তিপ্রবণ নিখিলেশ– ধর্ম-সত্যে বাঁধা তার সমস্ত বিশ্বাস, প্রগতির রজ্জুও দৃঢ় তবে তা আটকানো নিবৃত্তিতে। জমিদার হয়ে সে বৈষয়িক, প্রজাবৎসল, অধ্যাত্ম-আশ্রয়ী, ভেতরের সত্যে ও পরিবর্তনে আস্থাশীল – সেখানে স্বয়ং অধিক গুরুত্বপূর্ণ। অনুভূতিপ্রবণ প্রাণে সমাজ-শৃঙ্খলমুক্ত শুদ্ধ প্রাণের জন্যই সে বিমলাকে মুক্তি দেয় এবং সন্দীপকে প্রশ্রয় দেয়। প্রত্যাশাও তাই। 'নিখিলেশের সংসারসীমায় তার ত্যাগময় প্রেমশক্তির নিত্যতা-

যাচাইয়ের পরীক্ষায় অবতীর্ণ।' এই ভিন্নতার কারণে বন্ধুর সঙ্গে তার বিরোধ। বলপ্রয়োগে নয়, আত্মশক্তিতে দেশমুক্তির আস্থায় সে বিশ্বাসী। অসত্য নয়, সত্যলাভের জন্য সে নিবেদিত। সন্দীপের উগ্রতা তাকে বিচলিত করে, এক পর্যায়ে অশান্তির দিকেও ঠেলে দেয়। তীক্ষ্ণ মনোসংকটের ভেতরে পড়ে :

> আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এতকাল তা বুঝতে পরি নি। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে– কিন্তু শূন্য মন্দির মোর শূন্য মন্দির। ... সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে-জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না সেইখানে যে লোক একলা হয়েছে সে কি ভয়ানক একলা।

বিমলা যতো সন্দীপের নিকটবর্তী হয়েছে ততোই নিখিলেশ একপ্রকার শূন্যতার মধ্যে নিপতিত হয়েছে। একাকী সমাচ্ছন্ন হয়েছে। ক্রমশ সে হতাশার দিকে বেঁকে গেছে। এ পর্যায়ে তার দুটো বিষয় লক্ষ করা গেছে, ১. বিমলাকে নিয়ে মনের ভিতর ঘনীভূত হতাশা, ২. সন্দীপের কারণে রাজনীতিতেও হীনম্মন্যতা তৈরি হওয়া। এই দুটো বিষয় তার লোকোত্তর ভাবনাকে কৃষ্ণবর্ণে ঢেকে দিয়েছে। দ্বন্দ্বের প্রান্ত-অভিমুখ খুলে গেছে। চলার পথে একপ্রকার থমকে গেছে, দ্বন্দ্বদীর্ণ আত্মা মারকুটে হলেও মিইয়ে গেছে। যেন সে ব্যর্থতুর একটি স্তূপে পরিণত হয়েছে। এই কি বিশ শতকের শুরুর দিকের রবীন্দ্রমনন? রবীন্দ্রনাথ এ পর্বে স্বদেশ ও ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে মুক্তি নিয়ে নানা প্রবন্ধ লিখেছেন (১৩২১ থেকে ১৩২৪ সালের মধ্যে "বিবেচনা ও অবিবেচনা", "লোকহিত", "লড়াইয়ের মূল" প্রভৃতি)। এসব প্রবন্ধে স্বদেশব্রত, আত্মমুক্তি, হিতব্রতের কথা আছে। বন্দেমাতরম্-এর উগ্রতা নয় বা দেশমাতা বলে পুজোয় কোনো জীবনধর্মকে কাজে লাগানো নয়। নিখিলেশও বস্তুত তাই করছে। তাতে কি সে ফল না পাওয়ার শূন্যতায় ভুগছে! তাই কি ওই সমাজের আন্তর স্বরূপ? নাকি তার পরিবারের কোনো অভিমানী ছায়া তাকে ঢেকে দিয়েছে? সত্যিকার অর্থে কি 'ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝড়ো রাস্তা' – এ কি সেই 'ঝড়ো রাস্তা' অতিক্রমণের সময়– তার পরিবার ও সমাজ জীবনে– এমনকি রাজনীতিতেও! নিখিলেশ ঘাত-প্রতিঘাতে সমাচ্ছন্ন। শূন্যতার ভারে ক্রমশ উপলব্ধির একটি স্তর এখানে গড়ে ওঠে।

সন্দীপও অনন্য সৃষ্টি। এখানে নিখিলেশ যদি হয় ঘরের, তবে সন্দীপ বাইরের। বিপরীতসূচক। এ কোন মন। 'ভারতবর্ষে আমার জন্ম; সাত্ত্বিকতার বিষরক্তের মধ্যে থেকে একবার মরতে চাই না।' প্রকৃত অর্থে ওই সময়ের বাঙালি মন– যার আছে ক্রুদ্ধ আবেগ আর তীব্র উত্তেজনা। যেখানে তা দ্ব্যর্থহীন প্রেম-সংসর্গ-আশ্রয় সবকিছু থেকে ঝড়ো উৎসবে মেতে উঠতে পারে। এ ঝড় উদ্দাম-উল্লাসে, সাধন সর্বনাশে। এক মাদকতায় আচ্ছন্ন হয় চিত্ত। সন্দীপ সেই ঝাঁঝালো চিত্ত। সে ভোগবাদী, উগ্র বা স্থূল রুচির উদ্দাম পুরুষ। সে স্বদেশী। নেতা। তার মূল উদ্দেশ্য ভেঙে ফেল ও

ফললাভ কর। এবং যে কোনো উপায়েই হোক তা অর্জন করাই লক্ষ্য। একসময় বিমলাকে নিখিলেশ বলেছে, সন্দীপের বেশি কাছে যেও না ওকে দূরে থেকে দেখতেই ভালো লাগে। সে ক্যাজুয়াল, বহুমাত্রিক। বিমলাকে মক্ষী বলে। তাকে রানীর মর্যাদায় কাছে নিয়ে গেছে। কিন্তু তার এই কাছে নেওয়াও যেমন সহজ তেমনি ফেলে দেওয়াও কঠিন নয়। এগুলো বিশশতকী সমাজের নব্য-জাতীয়তাবাদী উগ্রতা ও উঠতি শ্রেণির অহং ও বিকারগ্রস্ততা। তবে এক অর্থে এর মাদকতা সভ্যতা-বিবর্জিতও নয়। সন্দীপ পুরুষভূমিকার নিম্নস্তরের অনাসৃষ্টি। সে বলে : 'যারা রাজ্য বিস্তার করেছে, সাম্রাজ্য গড়েছে, সমাজ বেঁধেছে, ধর্মসম্প্রদায় স্থাপন করেছে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষী দিয়ে এসেছে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যাকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যই সত্যের লোহার শিকল।' সমালোচক বলছেন : 'ঔপনিবেশিক কুশাসনের অবমাননা ও অসম্মাননার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট সন্দীপ। ইউরোপীয় অতি ভোগবাদী শক্তিনীতির বিশ্বগ্রাসী উল্লাসে সন্দীপও হয়ে উঠেছে ভারতীয় আদর্শ-উন্মুলিত নীতিবর্জিত বস্তুবাদী। সে রিয়ালিটির পৃথিবীর মানুষ। সে সবকিছু পেতে চায়, দুপায়ে মাড়াতে চায়। অধিকার ও কর্তব্যকে নিজের করে শুষিয়ে নেয়– এজন্য তার পিছুটান নেই।' 'আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আসছে, এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠছে।'– এইতো সন্দীপ।

ভোগবাদী সন্দীপের এই কর্ম-কাঠামোর কারণ কী? যে অবরুদ্ধ এক উপনিবেশবাদী সমাজে তার বেড়ে ওঠা, পরাধীনতার যে ক্ষেত্র তাকে হতোদ্যম করেছে প্রতিনিয়ত– সে প্রতিক্রিয়ার দর্পণ কি এই রুষ্ট বিনাশী বেদনা! সেখানে কি বিমলাকে কিংবা উগ্র আদর্শকে সে বুনিয়ে দিয়েছে স্বদেশীর নামে আপামর মানুষের ভেতরে! হ্যাঁ, উগ্র-সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ভোগবাদী সন্দীপ যা বিশ্বাস করেছে তাই করেছে, ভেতরের যন্ত্রণাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে, ক্ষোভ আর ক্লিশে মনঃকষ্টকে সে পরাজয় মনে করেনি, দাবি হিসেবে আদায় করে নিয়েছে, তার সংগ্রাম ও সম্মুখে চলার পথকে নির্বিবাদে গ্রহণ করেছে– হোক তাতে নীতিবর্জিত বা ক্ষণিকের কিছু পাওয়ার জন্য– নির্বিবাদে সবকিছু তুচ্ছ করে সে গ্রহণ করেছে। সবকিছু মিলেই মানবিক এবং নিজের দৃষ্টিকোণে অপরূপ ব্যক্তিত্বময় এই সন্দীপ। ভারতকেই যেন উচ্চতা দিয়েছে। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিকে এগিয়ে নিয়েছে– কিন্তু এসব করতে গিয়ে যে দাঙ্গা হয়েছে, দরিদ্রতর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, আবেগ ফুরিয়ে যাওয়ার পর নিজেকেও ভুল মনে করেছে– কিন্তু তাতে কোনো হতাশা বা শূন্যতা তাকে গ্রাস করেনি। নিজেই সে নিখিলেশের সাত্ত্বিকতাকে উড়িয়ে দিয়েছে, বায়বীয় বা অধ্যাত্ম নিয়তিকে করেছে পদদলিত। এই রবীন্দ্রনাথ বাস করেন পুঁজি-বিবৃত প্রতিক্রিয়াশীল সমাজে। সে উন্মুলতাই হোক বা সংকুচিতই হোক, বিকারগ্রস্ত হোক– সমাজের বাইপ্রোডাক্ট হিসেবে সেটি ওই সময় কিংবা একালেও অ-স্বীকার্য নয়। প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজি

সন্দীপের মতোই ভোগবাদী মানসিকতাকে আরূঢ় গ্রহণ করেছে। এটি সমাজেরই একটি চলকরেখা। মক্ষীরানী তো সে কারণেই ওই ভস্মে পা দিয়ে ফেলে। ঔজ্জ্বল্য ও চাকচিক্যে প্রবেশ করে, দেশমাতার বন্দনাকে খুব দ্রুত গ্রহণ করে– কারণ সন্দীপ নিশ্ছিদ্র ঝড়ো রাস্তায় চলমান। মাদকতা ও মানবীয়তায় আপাত সংস্কার বা দ্বিধা থাকলেও বিমলা বেরুতে পারে না। ফিরে আসলেও যে পথ গেছে অনেক দূর তা পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছ থাকে না। এটি ঠিক, ভারতীয় ঐতিহ্যের বিপরীত স্রোতটি সন্দীপ যেভাবে গ্রহণ করেছে– সেটি আকর্ষণীয় এবং তরঙ্গময়ও। তার যে দুর্বিনীত রূপ, ঔদ্ধত্যের উৎসার– সেটি ক্লাইমেক্স তৈরি করে। গুরুত্বপূর্ণও হয়ে ওঠে। কিন্তু উপন্যাসের নিয়মে তা ভেঙেও পড়ে। নতুন উদ্‌গমিত চিন্তায় সে এক পর্যায়ে স্তিমিতও হয়– 'আজ দেখি মনের মধ্যে ব্যথা লাগছে।' সন্দীপ অবশ্যই *ঘরে-বাইরের* প্রাণশক্তি। তার কর্মকাণ্ডে যে উগ্রতা আছে, ভারতবর্ষীয় কৃষ্টিকে অস্বীকার করার প্রবণতা আছে, রাজনীতির ভেতরে অপরাজনীতি আছে– তবুও সে ভিলেন নয়, শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে সে করুণাই সৃষ্টি করে। বিশ শতকে উঠতি পুঁজিবাদের ভেতরে সন্দীপ দেখেছে প্রথাগত সমাজ-ধর্মের বাইরে নিজেকে সৃজন করবার প্রয়াস। এটি প্রগতিশীলতা না হলেও জীবনের নঞর্থক দিকগুলো তলিয়ে দেখবার একটা প্রবণতা। এটি ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুরুদ্ধ বাসনা দমন করা নয় বা চলতি সংস্কার দিয়ে চাপিয়ে রাখা নয়, তাকে সাহস ও নির্ভয় দিয়ে গ্রহণ করার প্রত্যয়– যেটি অবদমিত থাকেনি, বিকৃতরূপে বিকারগ্রস্ততায় প্রকাশিত; কিন্তু তার ক্রেডিট অনস্বীকার্য– সমাজের চিত্ররূপে তা অবিমিশ্ররূপে উপস্থাপিত। সন্দীপ নিখিলেশের বিপরীত প্রবণতার।

উপন্যাসের মনস্তত্ত্বে অনবদ্য নারীচরিত্রটি। বিমলা *ঘরে-বাইরের* অন্যতম চরিত্র। উপন্যাসে সন্দীপের আগমন ও নিখিলেশের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষণের পর্বে বিমলার উপস্থিতি সদম্ভ, কাহিনির অনিবার্য প্রাণশক্তিও। বিমলা নারী। ভারতবর্ষীয় নারী। প্রচলিত সংস্কার ও মূল্যবোধে বাঁধা তার চেতনা। জমিদার নিখিলেশ ভারতবর্ষীয়; সে স্বদেশী করে কিন্তু মাঠের আন্দোলনে নয়, উদগ্র কিছু চরিতার্থ করা নয়, ভেতরের প্রকৃতির পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে মুক্তির অনুসন্ধান সে করে। সেই লক্ষ্যে তার উপনিবেশ-মুক্তির ভাবনা। এর মাঝে সন্দীপ ঠিক উল্টো। খুব বেশি পরিমাণ উগ্র এবং সক্রিয়, ইউরোপীয় ভাবাদর্শের বস্তুতন্ত্র বিকাররূপে তার চরিত্রে সহায়ক– যেখানে সংস্কার ও মূল্যবোধ প্রশ্নশীল। বিমলা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কয়েকটি কারণে, ১. নিখিলেশের ইচ্ছানুবর্তী হয়ে সে বাইরে পা রাখতে চায়, ২. সন্দীপ বিমলাকে বাইরে আনে, ৩. বিমলা বাইরে আসার পথে নিখিলেশের স্থির-ব্যক্তিত্ব দ্বারা আকৃষ্ট হয়, ৪. বিমলা স্বদেশী হওয়ার প্রত্যয় নিলে নিখিলেশ ও সন্দীপের দ্বন্দ্বের তীব্রতা প্রকট হয়, ৫. বিমলা প্রভূতরূপে সন্দীপ দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায় ভারতবর্ষের ঔপনিষদিক প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসতে থাকে, ৬. বিমলা আত্মদ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে

নিজেকে উন্মোচন করে, ৭. বিমলার মুক্তির পথ সঠিক না হলেও এক সময় নিখিলেশ-আইডিয়া দ্বারা ফিরে যায়, পূর্বের অবস্থানে, ৮. বিমলা আত্মদ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে নিজেকে রক্তমাংসের মানুষরূপে উপস্থাপন করে, ৯. বিমলার পৌরুষ-সংসর্গ নতুন ধারণা ও প্রবণতা সৃষ্টি করে– যা উপন্যাসের রাজনীতিতেও নতুন মাত্রার অভিযোজনা দেয়, ১০. নিখিলেশ-সন্দীপের ভেতর দিয়ে বিমলার বাইরের প্রবেশ তেমন লক্ষ্য না পেলেও মূল ক্ষেত্রটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছে, ১১. রবীন্দ্রনাথের নারীচেতনার স্বরূপ এতে অবমুক্ত হয়েছে। বিমলা উপন্যাসে এক জটিল মনস্তত্ত্ব। সে সংকট তৈরি করেছে, মেটাতেও পেরেছে। বৈরাগী, নির্বিশেষ, অনাসক্ত নিখিলেশের বিপরীতে বিমলার শূন্য হৃদয় খুঁজে পেয়েছে সন্দীপকে। তার মধ্যে ছিল অতৃপ্তিবোধ বা বাইরের টান। বাইরের টান তৈরিতে স্বামীর ইঙ্গিত স্বভাবসুলভভাবে গ্রহণ করলেও সন্দীপের অকুণ্ঠ আহ্বান তাকে প্রত্যয়ী করে তোলে। শুধু সংসারে নয় রাজনীতিতেও নিখিলেশ স্বদেশী হয়েও স্থির ও নির্বিকার। তাই তীব্র জ্বালায় সে বলে : 'আমি মানুষ, আমি দেবতা নই'। এইসব শূন্য হৃদয়ে প্রবল প্রাণের অধিকারী উদ্দাম সন্দীপ খুব দ্রুত অধিকার করতে সক্ষম হয় : 'সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগলেন আর এই বৃহৎসভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে যাবার জো হলো তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য মূর্তি দেখলুম। ... ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্তে এক কেন্দ্র থেকে আর-এক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগল গ্রীসের বারাঙ্গনার মতো আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলম্বিত চুল।' বিমলা ক্রমে অগ্রবর্তী সন্দীপের দিকে। সে বলেছে : 'রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কী দেখেছ তা জানি নে, কিন্তু আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি! সর্বনাশ গো সর্বনাশ, কী তার প্রচণ্ড শক্তি।' কিন্তু দ্বন্দ্ব ছিল। নিখিলেশের স্মৃতি তাকে ক্লান্ত করেছে। সংস্কারবোধ তাড়িত করেছে। কিন্তু তবুও এক পর্যায়ে সে সন্দীপকে অধিক গুরুত্ব দেয়। ভুলও ভাঙে। আত্মগ্লানি তৈরি হয়। স্বদেশী করতে গিয়ে মোহর চুরির প্রতিক্রিয়া, সন্দীপের অধঃপতনের প্রমাণরূপে অমূল্যর সাক্ষ্য বিমলাকে মোহমুক্ত করে। এই মুক্তির পথে সে অন্তর্দাহ বা যন্ত্রণা কম ভোগ করেনি। পরে আত্মোপলব্ধির ভেতর দিয়ে পাপবিনাশী বিমলা ফিরে আসে নিখিলেশের কাছে, বলে চলে 'আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছি; যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই।' বিমলার দ্বন্দ্বের যে পরিণাম তাই তাকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে : 'আমার স্বামী আমাতে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না?' সন্দীপের মুখোশ খুলে পড়লে সে দেখতে পায় তার দমিত রূপ। কার্যত, যে বংশপরম্পরা বা ঐতিহ্যের মধ্যে বিমলার বেড়ে ওঠা কিংবা যে নিখিলেশের পরিবারে তার অবস্থান ও বৃদ্ধি– সেটা তাকে মূল পথেই নিয়ে যায়। এই পথ সাত্ত্বিক,

লোকোত্তর, নিখিলেশের– এক অর্থে রবীন্দ্রনাথেরও। নিখিলেশের স্বামীপূজা সেবা কিংবা মেজরানীর মায়া তাকে ফিরিয়ে দেয়।

উপন্যাসটিতে কিছু অপ্রধান চরিত্র আছে। তারা সমগ্ররূপে ধরা না দিলেও প্রয়োজনকে ছাড়িয়ে গেছে। উদ্ভাসিত হয়েছে– স্বীয় মহিমায়। মেজোরানী, চন্দ্রনাথবাবু, পঞ্চু, অমূল্য এ উপন্যাসে গুরুত্বহীন নয়। এগুলো রবীন্দ্র-দর্শনজাত। চন্দ্রনাথ অনেকটাই অরূপ-অসীমান্ত, মেজরানী কৌতূকপ্রবণ আর অমূল্য সন্দীপের-স্বদেশীর কর্মযোগী। যদিও তা ভেস্তে গেছে, না-বোঝার কারণে।

৫.

ঘরে-বাইরে উপন্যাস-সৃজনে 'সমাজের জন্য শিল্প' তত্ত্বটি গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সমাজই মুখ্য। রাজনীতি তার কেন্দ্র। এ লক্ষ্যেই 'আত্মকথা'র ভেতর দিয়ে কাহিনি সৃজ্যমান। বর্ণনার ভেতরেই তৈরি হয়েছে ব্যক্তির আখ্যান ও চরিত্রের অবয়ব। পাঠ-প্রবাহের মধ্যেই চরিত্র ধরা পড়েছে পাঠকের নিকট। বিষয়টি নতুন– ওই বঙ্কিম-উত্তর উপন্যাসের পরিচর্যায়। *ঘরে-বাইরে* নিছক কোনো চরিত্রের কাহিনি নয়। উত্তর-উপনিবেশ (post-colonial) চিন্তার একটি ধারণা এর ভেতরে সুসম্পাদিত হয়েছে। ইউরোপীয় সংস্কৃতি বা অর্থনীতির বিপরীতে ভারতবর্ষীয় চিন্তা গড়ে উঠেছে। এই চিন্তার কেন্দ্রে সন্দীপ ও নিখিলেশ, উভয়ের অবস্থান। উভয়ের মধ্যে মতভেদ আছে, চিন্তার পার্থক্যও আছে কিন্তু উভয়েই উপনিবেশ-বিরোধী। রবীন্দ্র-দর্শনে তা পূর্ণ ভারতীয়। সন্দীপ যে পথ নিয়েছে তা উগ্র– এবং সেটিও বিলেতি পুঁজির উপলভ্য বিকার, তা নির্ধারিত পথে এগোয় না, সুপথে অগ্রগামীও নয়। ভারতবর্ষের সমাজস্তরের যে ধারা তার নিয়মে পড়ে না। কিন্তু চরম উগ্রতার 'বন্দেমাতরম্' বা দেশমাতার বিশ্বাসে সে প্রভাবিত। এখন সেটি অর্জনে ক্ষতিকর যাই হোক– লক্ষ্যনির্দিষ্ট পথে এগুনো সম্ভব। জাতীয়তাবাদের এ স্বরূপ যে লক্ষ্য নিয়েই আন্দোলিত হোক না কেন তা এলবার্ট বিল বা বিভিন্ন অ্যাক্টের পরিপন্থী হয়ে দেখা দিয়েছে। সেটি আখ্যানপ্রয়াসে পেয়ে যায় নান্দনিক উচ্চতা। প্রসঙ্গত, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিশ্বাস কী– সেটি মুখ্য নয়, রাজনীতির স্বরূপ ও পথ স্থান-কাল পরিবৃত্তে অঙ্কন করেছেন তিনি। সেখানে জরুরি হয়ে উঠেছে নির্ধারিত ভাষা ও শৈলী। এর ভেতরেই গ্রথিত নান্দনিক উচ্চতা। সেটি প্রথানুগ নয়। মুখ্যত, তিনটি চরিত্রের ভেতর দিয়ে গড়ে ওঠা এই কথা-পরম্পরা। বিমলার আত্মকথনে *ঘরে-বাইরে* শুরু। 'মা গো আজ মনে পড়ছে তোমার সেই সিঁথির সিঁদুর, সেই লালপেড়ে শাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ– শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখছি আমাদের চিত্তাকাশে ভোরবেলাকার অরুণরাগরেখার মতো।' এভাবে এক ভারতীয় নারীর কথন-পর্ব শুরু হয়। ক্রমশ তার মধ্যেই প্রাসঙ্গিক ব্যক্তি ইতিহাসের স্ফটিকস্বচ্ছ রূপ পেতে থাকে। দীর্ঘ আত্মবয়নে উঠে আসে স্বামী নিখিলেশের পরিবার ও তার দাম্পত্য জীবনের

অভিপ্রেত গঠন-কাঠামো। একইভাবে নিখিলেশ আত্মকথন শুরু করলেও সেটি তার ইতিহাস বয়ানের চেয়ে তা ক্ষণিক সময়ের সূচনা– যা অভিব্যক্ত বিমলার সম্পর্ক ও জীবনাগ্রহের বাতাবরণে। এটি নিরস নয়। উইট-হিউমারের রঙে ভরা। কর্মপ্রবাহের উচ্চারণে অধিক তুলনীয়। জীবন ভুঁইফোড় নয়, প্রকৃতিরঞ্জিত। নিখিলেশের ভক্তি প্রকৃতি অনুগত। সাত্ত্বিক। সংযত। ঔপনিষদিক মূর্তিমন্ত। ঠিক এর বিপরীতেই গড়ে ওঠে তেজী, অবাধ, লোলুপ, পাওনার অধিকারে সন্দীপ চরিত্রটি। তারপর দুই পুরুষ চরিত্রের বিরোধ দ্বন্দ্ব-ছন্দে মাতে। বিমলা মধ্যিখানে। কথোপকথন কথকের মুখে, বর্ণনাও কথক করেন। ফলে মনের তল, সমাজের দৃষ্টিকোণ, রাজনীতির ছক আর সামন্ত-অহং-অভিমান চতুর্দিকে ভীড় করে আসে। ব্যক্তিসর্বস্ব ব্যক্তি শুধু নিজেকে পরিচিত করায়। উপন্যাস তো ব্যক্তিরই প্রকাশক। তিনটি চরিত্রই তিন ধরনের স্বভাবে ব্যক্তিরূপে আবির্ভূত। এর মধ্যে বিমলা নারীর ছাঁচে গড়া, সে ভারতীয় নারী, ভারতবর্ষীয়। সংস্কার আর 'মা'-অধ্যুষিত। তার দর্শনও ছাঁচে গড়া। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে বের করে আনতে চান। সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে। প্রগতির শর্তে। নিখিলের যে স্থিতধী নির্বিকার পৌরুষত্ব তা অস্বীকার করেই। এই গড়ন নতুন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে। উপন্যাসে সেটির পরিণতি যাই হোক, উন্মোচন আলাদা। পুরুষতন্ত্রের বিপরীতে তার সুকঠিন বাঁধন, সে রাজনীতির ভেতরে প্রবিষ্ট হয়ে উন্মুক্ত আলোয় যেন বেরিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ বিশ শতকী নারীকে নির্মাণ করেন, পুঁজির প্রবাহে ও তার উৎপাদনশীল সম্পর্কের ভেতরে, চরিত্রকে স্বতন্ত্র রূপ দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃষ্টি বিমলা। এবং তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও মনে হয়। এর নান্দনিক স্পৃষ্টতাও আকর্ষণীয়। বিমলা শুধু ভারতীয় নারী নন, ভারতবর্ষের সংস্কার ও নীতি উপন্যাসের প্রথমাংশেই বর্ণিত তারপর সে ক্রমশ আলাদা– নির্মাণ-কাঠামোর কেন্দ্রে চলে আসে। এই আসাটাও আখ্যানে দ্যুতিময়। নিখিল তাকে স্বভাবমতো স্বাধীনতাটুকু দেয়, সন্দীপ সে স্বাধীনতার ভেতরে নতুন চাঞ্চল্য তৈরি করে। কেউই অকার্যকর নয়, স্বভাবমতো উৎকীর্ণ ও সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময়। বিমলা আনকোরা অভিপ্রায়ে ব্যক্ত হয়, তার অভিব্যক্ত স্বরূপই সন্দীপের প্রাধান্য, সন্দীপ কোমলে-কঠিনে উদ্বাহু হয়ে নারীসঙ্গ আর জৈবিক আগ্রহ অপরিশীলিত সন্দর্শনের কারণ ও প্রকৃতি নিয়ে হাজির হয় বিমলার সম্মুখে। প্রাথমিকভাবে বিমলা নিখিলেশের স্ত্রী হিসেবে যে মানসিক অপূর্ণতা বা অপরিতৃপ্তি তারও প্রাপ্তি ঘটে, ফলে বিমলা প্রগতির ভেতরে নৈপুণ্য নয়, উপরের দৃশ্যমান আভার চমকটুকু সে পেয়ে যায়। এই পাওয়ায় উপন্যাসের গতি আলাদা। বিমলাতেও সে পূর্ণ অভিব্যক্ত। স্বয়ম্প্রকাশও। তাতে করে পুরুষ চরিত্র নির্মেদরূপে দাঁড়িয়ে যায়। বিশেষ করে পৌরুষময় নিখিল, কর্তৃত্ববাদী নিখিল, সংহত-সাত্ত্বিক নিখিল, স্থির রাজনীতিক নিখিল প্রকাশিত– এবং ক্রমাগত তার গতি দ্বৈরথ যুক্ততায় পর্যবসিত। প্রতিপক্ষরূপে মুখোমুখি হয় সন্দীপ। এটি স্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব। তীব্র বেগ তাতে ঝড়ো পরিবেশ প্রস্তুত করে উপন্যাসে– তাতে

নিখিলেশ ও সন্দীপের তত্ত্বও যুক্তিহীন বা আবেগযুক্ত হয়, কখনোবা নিরাবেগ পরাকাষ্ঠার তীব্রতাতেও তরঙ্গায়িত। তবে এসব উত্তেজক অভিমুখ পরস্পরের মধ্যে সম্ভাব্য শক্তিকে সমুপস্থিত করে। জীবনবোধের স্বরূপ প্রকাশ্য হয়। যৌনতা ও মনঃসমীক্ষণের পর্যায়টিও তাতে ধরা পড়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো এক জায়গায় গিয়ে সবকিছু মিলিয়ে দেন, মেলোড্রামাটিক পরিবেশে বিমলা ফিরে আসে আর সন্দীপ ক্লান্ত হয়ে ব্যর্থ মনোরথে স্থানু হয়ে পড়ে। 'ঘরে-বাইরে'র নান্দনিক দিকটি পূর্ণায়ত নয়। তাতে ক্লান্তি আসে কিন্তু পূর্ণ কাঠামোটির ভেতরে কোনো অবক্ষয় ধরা পড়ে না। প্রমাণস্বরূপ আমরা কিছু উদ্ধৃতি তুলে নিতে পারি :

ক) 'অ্যাফিনিটি!' জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, তাদের মিলই মন্ত্রের মিলের চেয়ে খাঁটি, এমন কথা সময়মত দরকারমত অনেক জায়গায় বলেছি। তার কারণ, মানুষ মানতে চায় প্রকৃতিকে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না দিলে তার সুখ হয় না। এইজন্যে মিথ্যে কথায় জগৎ ভরে গেল। অ্যাফিনিটি একটা কেন? অ্যাফিনিটি হাজারটা। একটা অ্যাফিনিটির খাতিরে আর সমস্ত অ্যাফিনিটিকে বরখাস্ত করে বসে থাকতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে এমন লেখাপড়া নেই। আমার জীবনে অনেক অ্যাফিনিটি পেয়েছি, তাতে করে আরো একটি পাবার পথ বন্ধ হয় নি। সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সেও আমার অ্যাফিনিটি দেখতে পেয়েছে। তার পরে? তার পরে আমি যদি জয় করতে না পারি তা হলে আমি কাপুরুষ। (সন্দীপের আত্মকথা)

খ) নিখিল বললে, প্রবৃত্তিকে আমি তখনই সত্য বলে মনে মানি যখন সঙ্গে সঙ্গেই নিবৃত্তিকে সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিস গুঁজে দেখতে গেলে চোখকেই নষ্ট করি, দেখতেও পাই নে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকে বিকৃত করে সত্যকেও দেখতে পায় না।

আমি বললুম দেখো নিখিল, ধর্মনীতির সোনাবাঁধানো চশমার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি; এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপসা দেখো, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পার না। (সন্দীপের আত্মকথা)

গ) সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিসটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্যদেবতার রথ আসছে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর-গুর করছে। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল একটা- কী পরমাশ্চর্য এসে পড়ল ব'লে, তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে বিচার-বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া-মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি তো একে কোনোদিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে বসে থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখো এর জন্যে আমার তো কোনো জবাবদিহি নেই। এতদিন একমনে আমি যার পূজা করে এলুম, বর

> দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা! তাই, সমস্ত দেশ যেন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠছে 'বন্দে মাতরম্; আমার প্রাণে তেমনি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেছে 'বন্দে'– কোন্ অজানাকে, অপূর্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টি ছাড়াকে! (বিমলার আত্মকথা)

উদ্ধৃতি থেকে ফিকশন-চিন্তার দর্পণটি চিনে নেওয়া সম্ভব হয়। কতোটা তার দৃষ্টিকোণ (point of view) তাও উপলব্ধি করা যায়। কিংবা কোনো তত্ত্বের আধারে ফেলেও জ্ঞানের বলয় তৈরি করা সম্ভব হয়। এই সম্ভাব্যতাই রবীন্দ্রনাথের নন্দনালোক। যেটি কল্পনাশক্তির প্রয়োগ আর ভাষার তীক্ষ্ণতায় অনুরণিত। বক্তব্যও সৃষ্টিগুণে উল্লসিত। তীব্র তার শ্লেষ ও উইট। জ্ঞান কোনো বন্দনা নয়, যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। চরিত্রগুলোকে প্রতীকী ধরলে তাদের ভেতর দিয়ে সামষ্টিক জীবনের সম্ভাব্য রূপ পুনর্গঠিত হয়। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিকোণে বিমলা বা সন্দীপ-নিখিলেশ সমাজ-ধর্ম-ইতিহাস অনুধাবনে নিজ নিজ চিন্তা থেকে স্বীয় বক্তব্য বা তথ্য-ব্যাখ্যা করে। এ লক্ষ্যে নিখিলেশ স্বভাবজাত, ভাষার অভিব্যঞ্জনায় সে অনেকটাই রবীন্দ্রানুগ তথা অধ্যাত্ম ও স্থির-মনস্কজাত, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি কাঠামোই তার ধর্ম। নির্ধারিত অধ্যায় বিভাজন নয়, আত্মকথনের মধ্যেই চরিত্র তার স্বগতোক্তি করে, সেখানে যুক্তিপরম্পরা-শৃঙ্খলা, সাধ্য-সাধ্যায়ত্ত চরিত্রানুগ। যুক্তিও তীব্র ও তীক্ষ্ণতর, 'ধর্মনীতি সোনাবাঁধানো চশমার' মতো। কবির মানসপট তাতে প্রতিশ্রুত। সেজন্য বয়নে অন্তঃসলিলা স্রোত আছে। এ রীতিটি জেমস জয়েস (১৮৮২-১৯৪১), ভার্জিনিয়া উলফ (১৮৮২-১৯৪১) সঞ্জাত। ইন্টেরিওর মনোলগ ['Interior monologue in classical narrative artists exhibits a number of intersting characteristics, some of which serve to distinguish it from later manifestations of the device, but many of which seem to have remained characterstic of it in its modern forms also.'] (Scholes & Kellogg, 1968 : 178)। যেন বিশ শতকী বাস্তবতার পুনর্মুদ্রণ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপনাসের ধারায় বিবরণের যে বহির্মুখী রীতি, চরিত্র-সংস্থাপন বা ঘটনার সংস্থান সেটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভেতরে অবশ্যই পরিবর্তমান। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে রবীন্দ্রকাব্যেরও [*বলাকা* (১৯১৬) কাব্য] ছন্দরীতিতে পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় এ সময়ে। *ঘরে-বাইরে*তে চলিতরীতির [প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্রে' (১৯১৪)র প্রভাব পরবর্তী ধারা] প্রয়োগ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে রচিত উপন্যাসগুলোর মতো গদ্যভঙ্গি *ঘরে-বাইরে*তে নেই। চলিত গদ্যে অন্তর্জগতের চিত্র আত্মকথনে প্রকাশের অবকাশ পেল। ভাষাটিও যেমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ তেমনি অলঙ্কারসদৃশ, বক্তব্যানুগ, উইটধর্মী; সংলাপ পরিমিত, উপলব্ধি বন্ধনশীল, যূথবদ্ধ এবং সংকেতপুঞ্জাশ্রয়ী। ভাষার এমন প্রাকরণিক উৎকর্ষ নিঃসন্দেহে উপন্যাসটির নতুন অভিমুখ।

৬.

আগেই উল্লেখ করেছি, *ঘরে-বাইরের* পুনঃপাঠ ঠিক তত্ত্বালোচনার নয়। তবে পর্যবেক্ষণে যে পাঠ ও আন্তঃপাঠ গড়ে ওঠে তাতে মনে হয় *ঘরে-বাইরে* অবশ্যই যুগন্ধর উপন্যাস। আলাদা ভাষাভঙ্গিতে এটি রচিত। উপস্থাপন কৌশলও আলাদা। তিনটি প্রধান চরিত্রের স্বীয় আত্মকথনে সম্পূর্ণ কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। এই ব্যক্ততায় চিন্তার নৈর্ব্যক্তিকতা প্রতিশ্রুত। মননশীলতারও নানান পদক্ষেপ প্রকাশিত। স্মর্তব্য যে, *ঘরে-বাইরের* চৌম্বক সৃষ্টি বিমলা। যে বিমলা *ঘরে-বাইরেতে* নারীর 'আইকন'রূপে প্রতিষ্ঠিত। নারী-জন্ম, সমাজ-পুরাণ-ইতিহাস ধারণ করে 'বাহির পানে চাওয়া' খুব সহজ নয়। একালেও তা সহজ কেউ বলবে না। কিন্তু *ঘরে-বাইরেতে* সেই দুর্ভর নারী-শক্তিটি প্রদর্শিত হয়েছে। বোধ করি, সে চিন্তায় 'ঘরে-বাইরে'র নামকরণটিও। প্রগতির সংগ্রামে সমাজনীতি ও সংস্কার কম প্রতিকূলতা নয়। যারা শাস্ত্র বানান তারা মিথ্যে-কল্পনা দিয়ে অনেককিছু নিজের করায়ত্তে আনতে চান। রবীন্দ্রনাথ *ঘরে-বাইরেতে* শেষ পর্যন্ত সে পরিণতিই দেখান। দ্বন্দ্ব বা প্রতিকূল প্রান্তের অভিমুখগুলো শিল্পিতরূপে প্রকাশ করতে সক্ষম হন। ঠিক তুল্যমূল্য নয়, সংস্কারমুক্ত ও যৌক্তিক অভিব্যঞ্জনায়। এতে উপন্যাসটি তখন আর সমকালিক থাকে না। প্রশ্ন তুলে, সমাজের সম্মুখ-বিপরীত বা আলো-অন্ধকার জিজ্ঞাসায় দ্বন্দ্বময় স্বরূপটি দেখাতে সক্ষম হন। পুঁজির বৈধ-অবৈধ রূপ বা তার বিকার কীরূপে সন্দীপকে সর্বগ্রাসী করে তোলে– তা এখানে জানা গেছে। আবার বিপরীতে নিখিলেশের তন্ত্রমন্ত্র স্বস্তি-ধীর বৌদ্ধিক পথচলাও কতোটা ভারতবর্ষে কাজে লাগবে তারও ইঙ্গিত অনুধাবন করা যায়। ফলত সামগ্রিক এক কর্মচিন্তন– যেখানে '*ঘরে-বাইরের* মূল্য কখনো নষ্ট হয় না, ... আরেক প্রজন্ম এসে তাকে নতুন করে আবিষ্কার করে নেবে, পুরোনো তরুণেরা ততদিন কবরে!' (শঙ্খ, ২০১৭ : ৮০)। নতুন-কাঠামো এবং নতুন-বিষয়ের চিরকালিক 'প্যাকেজ' *ঘরে-বাইরে* যা কখনো পুরাতন নয় বরঞ্চ প্রসিদ্ধির তাপেই ভাস্বরমণ্ডিত হয়, মলিন হয় না এতটুকুও। অথরের মৃত্যুর পরও কালস্রোতে ক্রম-পরিবর্তমান পাঠক তার প্রভাবকে যেন সম্মুখে এগিয়ে নেয়, চিরন্তন করে রাখে।

টীকা

১. 'প্রাতিভাসিক জীবনের সকল পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের পশ্চাতে সর্বাতিরিক্ত ঐক্য, একত্ব ও স্থিরতার ভাবনা... স্থিরতা ও একত্বকে প্রথমে মনে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয়; এমন কিছু নেই যা চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল নয়, এমন কিছুই নেই যার প্রতিরূপ নেই, বিপরীত নেই, সুসমঞ্জস ও বিরোধপূর্ণ অংশ নেই... এই সকল পরিবর্তন ও গতির সমষ্টি একান্তই স্থির, নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনশীল...' (শ্রীঅরবিন্দ, *উপনিষদাবলী*, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী, পুনর্মুদ্রিত ১৯৯৫, পৃ. ৬)

বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

দেবেশ রায় (২০১৫)। "উপন্যাসের সংকট", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট ভবনে কবি-অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান স্মারক বক্তৃতা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৩৭৩)। *কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ*, বাকসাহিত্য, কলিকাতা

ফকরুল আলম (২০১৬)। "রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ এবং প্রভাবের যন্ত্রণা", *ধানসিড়ি*, মুহম্মদ মুহসীন (সম্পা.) বরিশাল

রবীন্দ্র-রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড, ১৯৭৪)। বিশ্বভারতী, কলিকাতা। [*ঘরে-বাইরে* উপন্যাসের উদ্ধৃতিসমূহ এ গ্রন্থ থেকে উৎকলিত)

রলাঁ বার্ত (২য় সং, ২০১৫)। *রচয়িতার মৃত্যু*, জি এইচ হাবীব (অনূ.), ভাষান্তর, ঢাকা

শঙ্খ ঘোষ (ভূমিকা অনুবাদ অনুষঙ্গ) (দশম সং, ২০১৭)। *ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

সত্যজিৎ রায়, ১৯৮৪ তে মুক্তিপ্রাপ্ত *ঘরে-বাইরে* চিত্রনাট্যের প্রারম্ভিক সংলাপ।

সৈয়দ আকরম হোসেন (পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯৪)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ইংরেজি গ্রন্থ

Robert Scholes & Robert Kellogg, (1968)। *The nature of Narrative*, Oxford University Prees, New York